বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা গ্রন্থের উৎস ও নির্দেশনা

বিশদ বর্ণনা ঃ DN- দীর্ঘ নিকায়
MN- মজ্জিম নিকায়
SN- সংযুক্ত নিকায়
AN- অঙ্গুত্তর নিকায়

বুদ্ধ

অংশ	পৃষ্ঠা	সারি	উৎস
পরিচ্ছেদ 1			
1	2	1	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	4	17	AN-৩-৩৮, সুখুমালা সুত্ত
	5	3	MN-৩-২৬, আরিয়াপরিয়েসন সুত্ত
	5	11	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	6	3	MN-৯-৮৫, বোধিরাজকুমার সুত্ত
	6	6	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	6	12	সুত্ত-নিপাত ৩-২, পধান সুত্ত
	6	17	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	7	6	বিনয়, মহাবগ্গ
	8	1	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
2	9	1	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	9	21	পরিনিব্বাণ সুত্ত
	11	14	পরিনিব্বাণ সুত্ত
	11	20	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত

পরিচ্ছেদ 2

1	13	1	অমিতায়ুর-ধ্যান এবং বিমালাকীর্তি-নির্দেশ সূত্র
	13	5	সূরংগম সূত্র
	13	9	বিমলকীর্তি-নির্দেশ এবং মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	14	1	সৎধর্মপুন্ডারীক সূত্র ১৬
	14	15	মহাযান-জাতক-চিত্তভূমি-পরীক্ষা-সূত্র
	14	20	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
2	16	9	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৩
	17	5	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৪
	18	15	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৫
3	19	14	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৬

পরিচ্ছেদ 3

1	22	1	অবতমসক সূত্র ৫
	23	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	23	7	অবতমসক সূত্র
	23	14	সুবর্ণপ্রভাসত্তমরাজ সূত্র ৩
2	25	15	অবতমসক সূত্র
	25	20	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্ধভূহ
	26	2	ছোট সুখাবতীভূহ সূত্র
	26	6	অবতমসক সূত্র
	26	11	SN-৩৫-৫
	26	15	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
3	28	9	MN-৮-৭৭, মহাসকুলূদয়ি সুত্ত

	29	4	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	29	14	লংকাবতার সূত্র
	29	24	অবতমসক সূত্র ৩২
	30	11	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ২৫
	30	16	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	31	2	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ২
	31	7	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ২

ধর্ম

পরিচ্ছেদ 1

1	34	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৬ এবং SN-৫৭-১১-১২, ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত
	35	9	ইতিবুত্তক ১০৩
	35	19	MN-২, সব্বাসব সুত্ত
	36	1	৪২ সেকশনের ১৮
	36	14	শ্রীমালাদেবীসিংহনাদা সূত্র
2	38	6	অবতমসক সুত্র ২২, দশভূমিক

পরিচ্ছেদ 2

1	41	1	MN ৪-৩৫, চূলসচ্চক সুত্ত
	42	20	AN-৫-৪৯, রাজমুন্ধ সুত্ত
	43	6	AN-৪-১৮৫, সমন সুত্ত
	43	11	AN-৩-১৩৪, উপ্পাদ সুত্ত
2	43	18	লংকাবতার সূত্র
	43	21	অবতমসক সূত্র ২
	44	7	অবতমসক সূত্র ১৬

	44	19	অবতমসক সূত্র, দশভূমিক
	45	2	লংকাবতার সূত্র
	45	7	AN- ৪-১৮৬, উম্মগ্ন সুত্ত
	45	10	ধম্মপদ ১, ২, ১৭, ১৮
	45	20	SN-২-১-৬, কামদ সুত্ত
3	46	5	অবতমসক সূত্র ১৬
	46	11	লংকাবতার সূত্র
	47	3	MN-৩-২২, অলগদ্দূপম সুত্ত
	47	17	লংকাবতার সূত্র
	47	21	লংকাবতার সূত্র
4	50	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৬
	50	10	লংকাবতার সূত্র
	50	15	SN-৩৫-২০০, দারুক্খন্ধ সুত্ত
	51	4	লংকাবতার সূত্র এবং অন্যান্য
	51	15	MN-২-১৮, মধুপিন্ডিক সুত্ত
	52	4	লংকাবতার সূত্র
	52	19	লংকাবতার সূত্র
	53	12	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
	55	6	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্দভূহ
	55	14	লংকাবতার সূত্র এবং অন্যান্য

পরিচ্ছেদ 3

1	56	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৫
	56	12	বিনয়, চূলবগ্গ ৫-২১
	56	18	সূরমগম সূত্র
2	60	17	সূরমগম সূত্র
	62	3	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

	62	9	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৭ এবং সূরমগম সূত্র
	62	22	অবতমসক সূত্র ৩২
	63	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	63	5	ব্রম্মজাল সূত্র
	63	12	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
3	64	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

পরিচ্ছেদ 4

1	68	1	শ্রীমালাদেবীসিমহনাদ সূত্র
	69	4	AN-২-১১
	69	8	ইতিবুত্তক ৯৩
	69	12	বিনয়, মহাবগ্ন
	69	22	AN-৩-৬৮, অঞ্ঞাতিত্থিক সুত্ত
	70	7	AN-৩-৩৪, আলবক সুত্ত
	70	17	বৈপুল্যা সূত্র
	70	21	বিনয়, মহাবগ্ন ১-৬, ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত
	71	3	MN-২-১৪, চূলদুক্খক্খন্ধ সুত্ত
	71	16	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	72	14	ইতিবুত্তক ২৪
2	74	1	MN-৬-৫১, কনদরক সুত্তন্ত
	74	14	AN-৩-১৩০
	74	22	AN-৩-১১৩
3	75	10	ইতিবুত্তক ১০০
	75	22	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র
	76	17	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

	77	19	AN-৩-৬২
	78	9	AN- ৩-৩৫, দেবদূত সুত্ত
	79	5	থেরীগাথা অথকথা
4	80	1	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড

পরিচ্ছেদ 5

1	85	1	সুখাবতীভূহ সূত্র ১ম খন্ড
	88	7	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড
	89	11	অমিতায়ুর-ধ্যান-সূত্র
	92	1	ছোট সুখাবতীভূহ সূত্র

অনুশীলনের উপায়

পরিচ্ছেদ 1

1	92	1	MN-২, সব্বাসব সুত্ত
	97	12	MN-৩-২৬, অরিযপরিযেসন সুত্ত
	98	2	SN-৩৫-২০৬, ছপান সুত্ত
	98	18	৪২ সেকশনের সূত্র ৪১-২
	100	15	MN-২-১৯, দ্বেধাবিতক্ক সুত্ত
	101	6	ধম্মপদ অথকথা
2	102	1	AN-৩-১১৭
	102	11	MN-৩-২১, ককচূপম সুত্ত
	104	23	MN-৩-২৩, বম্মীক সুত্ত
	106	5	জাতক IV-৪৯৭, মাতঙ্গ জাতক
	108	23	৪২ সেকশনের সূত্র ৯

	109	4	৪২ সেকশনের সূত্র ১১
	109	18	৪২ সেকশনের সূত্র ১৩
	110	22	AN-২-৪, সমচিত্ত সুত্ত
3	111	9	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র
	119	9	মহাপরিনির্বাণ সুত্ত
	119	25	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র

পরিচ্ছেদ 2

1	123	1	MN-৭-৬৩, চূলমালুঙ্গ সুত্তন্ত
	124	17	MN-৩-২৯, মহাসারপম সুত্ত
	126	1	মহামায়া সুত্ত
	126	10	থেরগাথা অথকথা
	127	20	MN-৩-২৮, মহাহত্থিপদপম সুত্ত
	128	8	মহাপরিনির্বাণ সুত্ত
	128	18	অবদানশতক সূত্র
	129	18	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	131	5	পঞ্চবিমশতি শহশ্রীকাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র
	132	8	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্দভূহ
2	133	8	AN-৩-৮৮
	134	14	AN-৩-৮১
	134	19	AN-৩-৮২
	135	7	পরিনির্বাণ সূত্র ২য় খন্ড
	136	2	MN-১৪-১৪১, সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত
	137	3	পরিনির্বাণ সূত্র ২য় খন্ড
	137	15	AN-৫-১৬, বল সুত্ত

	137	19	অবতমসক সূত্র
	138	10	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	138	22	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র
	139	11	সুবর্ণপ্রভাস সূত্র
	139	23	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	140	16	থেরগাথা অথকথা
	141	6	জাতক ৫৫, পঞ্চাবুধ জাতক
	142	6	ইতিবুত্তক ৩৯ এবং ৪০
	142	15	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	142	17	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	142	19	AN-৫-১২
	143	3	পরিনির্বাণ সূত্র
	143	12	শূরমগম সূত্র
3	144	14	SN-৫৫-২১ এবং ২২, মহানাম সুত্ত
	145	5	AN-৫-৩২, চুন্দী সুত্ত
	145	11	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
	145	21	শূরমগম সূত্র
	146	4	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড
	146	13	SN-১-৪-৬
	146	15	অবতমসক সূত্র ৩৩
	147	8	অবতমসক সূত্র ২৪
	147	18	সুবর্ণপ্রভাস সূত্র ৪
	148	2	অমিতায়ুর-ধ্যান-সূত্র
	148	4	সুখাবতীভূহ সূত্র
	148	10	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	149	2	MN-২-১৬, চেতোখিল সুত্র

	149	14	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড
4	150	7	ধম্মপদ
	157	11	SN-১-৪-৬
	157	23	AN
	158	3	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

ভ্রাতৃসংঘ

পরিচ্ছেদ 1

1	160	1	ইতিবুত্তক ১০০ এবং MN-১-৩, ধম্মদায়াদ সুত্ত
	160	7	ইতিবুত্তক ৯২
	161	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৩০
	161	17	MN-৪-৩৯, মহা-অস্সপুর সুত্ত
	162	23	MN-৪-৪০, চূলঅস্সপুর সুত্ত
	163	19	সদ্ধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৯
	164	1	সদ্ধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৯
	164	9	সদ্ধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৯
2	165	20	SN-৫৫-৩৭, মহানাম সুত্ত
	166	7	AN ৩-৭৫
	166	12	SN-৫৫-৩৭, মহানাম সুত্ত
	166	16	SN-৫৫-৫৪, গিলায়নম সুত্ত
	166	22	অবতমসক সূত্র ২২
	168	4	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	170	10	অবতমসক সূত্র

	172	22	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	173	19	অবতমসক সূত্র
	174	11	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

পরিচ্ছেদ 2

1	176	1	DN-৩১, সিংগালোবাদ সুত্ত
	181	3	AN-২-৪, সমচিত্ত সুত্ত
	181	18	AN-৩-৩১
	182	2	জাতক ৪১৭, কচ্চানি জাতক
	183	14	DN-৩১, সিংগালোবাদ সুত্ত
	184	1	ধম্মপদ অথকথা ১
2	185	8	AN-৪-১৯৭
	185	22	AN-৫-৩৩৩ উগ্গহ সুত্ত
	186	14	বার্মা অর্থকথা
	187	6	AN-৭-৫৯, সুজাত সুত্ত
	188	17	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	189	19	শ্রীমালাদেবীসিমহনাদ সূত্র
3	191	16	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	192	15	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্দভূহ
	193	18	সুবর্ণপ্রভাস সূত্র
	194	12	বোধিসত্ত্ব-গোচরোপায়-বিষয়বিকুর্বন-নির্দেশ-সূত্র

পরিচ্ছেদ 3

1	201	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	202	17	AN-৩-১১৮, সোচেযন সুত্ত
	204	4	SN

	204	15	বিনয়, মহাবগ্গ ১০-১ এবং ২
	204	23	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	206	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১০-১ এবং ২
2	208	7	SN
	209	3	The Chuin Kyo Sutra
	209	9	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
	210	11	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	211	2	ছোট সুখাবতীভূহ সূত্র
	211	7	সুখাবতীভূহ সূত্র
	211	19	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
3	212	6	ধম্মপদ অথকথা ১
	212	14	AN-৩৪-২
	213	9	ধম্মপদ অথকথা ১
	214	1	AN-৫-১
	214	4	সরবাসতিবাদ-সংঘবেদক-বস্তু ১০
	214	17	MN-৯-৮৭, অঙ্গুলিমাল সুত্ত
	215	15	AN ২৬

পরিশিষ্ট

বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১
ভারত

মানব সভ্যতার আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐ সময়টাকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যখন ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যবর্তী অংশে "এশিয়ার আলো" উজ্জ্বলরূপে আলোকিত হয়ে উঠে। অথবা অন্য কথায়, যখন মহান প্রজ্ঞা এবং করুণার ফল্গুধারা এই পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তা সময়ের বিবর্তনে শতাব্দীকাল ধরে আজ পর্যন্ত মানব হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে আসছে।

বুদ্ধ গৌতম যিনি পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের অনুসারীদের কাছে শাক্যমুণি বা "শাক্য বংশীয় নক্ষত্র," হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করে প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও সাধক হয়ে, দক্ষিণে মগধ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহা বিশ্বাস করা হতো, তিনি শেষ পর্যন্ত সেখানকার এক বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর মহান মৃত্যু বা মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মহা প্রজ্ঞা ও করুণার বাণী প্রচার করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে, ঐ রাজ্য ও মধ্যভারতের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বুদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করে।

মৌর্য রাজত্বের তৃতীয় রাজা সম্রাট অশোকের (খৃষ্টপূর্ব ২৬৮-২৩২) শাসন আমলে সমগ্র ভারতীয় ভূখন্ডে এবং দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধের শিক্ষার প্রসারতা লাভ করে।

মৌর্যবংশ ছিল ভারতের সর্বপ্রথম সংযুক্ত রাজ্য। এই রাজ্যের প্রথম শাসক চন্দ্রগুপ্তের আমলে (খৃষ্টপূর্ব ৩১৬-২৯৩), এক বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর রাজত্ব ছিলো, যা উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সমগ্র বিন্দা পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজা অশোক এরপরও দক্ষিণ

দিকে কলিঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য দখল করে ডিকান মালভূমি পর্যন্ত রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন।

এই রাজা স্বভাবগতভাবে খুবই হিংস্র ছিলেন বলে বলা হত। প্রজাগণ তাঁকে ছন্ডাশোক নামে ডাকত (হিংস্র অশোক)। কিন্তু কলিঙ্গ দখলকালীন সময় এর ধ্বংসযজ্ঞের অবস্হা দেখে তাঁর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটান। তিনি মহা প্রজ্ঞা ও করুণার শিক্ষার আলোকে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। এরপরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একজন অনুসারী হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে দু'টো কাজ সবচেয়ে বেশী বর্ণনার দাবী রাখে।

এর প্রথমটি হলো "খোদাই করা অশোকানুশাসন," বা বুদ্ধের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রণীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো পাথরের স্তম্ভে বা পরিচ্ছন্ন পাথরের দেয়ালে খোদাই করে রাখা, যা তাঁর নির্দেশে অসংখ্য স্হানে করা হয়েছিল এবং এভাবে বুদ্ধের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের প্রজ্ঞা ও করুণার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। বিশেষতঃ সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তা হলো, তাঁর দ্বারা প্রেরিত প্রচারকগণ ঐ সকল দেশে পাঠানো হয়েছিল, যেমন-সিরিয়া, মিশর, কিরিন, মেসেডোনিয়া, এবং ইপিরস; যার লক্ষ্য ছিল বুদ্ধের শিক্ষাকে দূরপ্রাচ্য থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। অধিকন্তু, মহেন্দ্রকে (পালি ভাষায় মহিন্দ) দিয়ে তাম্রপন্নি বা সিলোন এ পাঠানো প্রচারাভিযান ছিল সফল; যা বুদ্ধের সুন্দর শিক্ষাকে সুন্দর লংকা দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইহাকে ঐ দ্বীপে বুদ্ধের শিক্ষা প্রসারের সফল ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

২

মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি

"বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভীমুখী পদচারণা" পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলোতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সুস্পষ্ট

লক্ষ্য ছিল পশ্চিমা বিশ্ব। খৃষ্টাব্দ শুরু হওয়ার সময়কাল থেকে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বাভীমুখী অভিযাত্রা শুরু করে। যাই হোক, এই বিষয়ে উল্লেখ করার আগে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিরাট পরিবর্তনটি আলোচনার দাবী রাখে। এই পরিবর্তনটি আর অন্য কিছু নয়, তা হলো "নতুন উদ্দীপনা" যাকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের বড় গাড়ী হিসেবে বলা হয়। ঐ সময়ে শক্তিশালী ভিত লাভ করেছিল এই মহাযান। তখনকার সময়ের শিক্ষাগুলোর মধ্যে ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল।

কখন, কিভাবে এবং কার দ্বারা এই "নতুন উদ্দীপনা" শুরু হয়েছিল ? এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেহই দিতে পারেননি। তবে, আমরা সবাই অবগত আছি, প্রথমতঃ, এই ধারণা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ঐ সময়কার তথাকথিত স্বতন্ত্র চিন্তাবিদদের নিয়ে গঠিত মহাসংঘিকা নামক দলের প্রগতিশীল সাধকদের দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ, ইহাও হতে পারে, খৃষ্টপূর্ব ১ম অথবা ২য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টাব্দ ১ম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালেই মহাযান ধর্মগ্রন্থের কিছু গুরুত্বপুর্ণ উপাদান বিরাজিত ছিল। যখন নাগার্জুনের উৎকৃষ্ট মানের চিন্তা-ধারা যা পরবর্তিতে মহাযান ধর্ম গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মের ইতিহাসে নিজেকে প্রথম সারিতে নিয়ে গিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম যে ভূমিকা রেখে আসছে তা অপরিসীম। বর্তমান, চীন এবং জাপান এ দু'দেশের বৌদ্ধ ধর্ম এবং তাদের প্রায় সব ইতিহাস মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বিকশিত হয়ে আসছে। এখানে অবাক হওয়ার কিছু'ই নেই কারণ জনগণকে রক্ষার জন্য নতুন এরূপ আদর্শের প্রচলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তদুপরি বোধিসত্ত্বের আকারে জীবিত সাধকদের প্রাক্ অনুমানকে উপজীব্য করেও তা অনুশীলন করা হয়েছিল; অধিকন্তু, জনগণকে সাহায্য করার জন্য, মহাযান চিন্তাবিদদের দ্বারা যে মনস্তাত্ত্বিক বা প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কিত বুদ্ধিভিত্তিক যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছিল, তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়।

এভাবে, একদিকে তা বুদ্ধ গৌতমের শিক্ষার সাথে যদিও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল, তথাপি প্রজ্ঞা ও করুণার অনেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। এসব নতুন সংযুক্তির মাধ্যমে, বৌদ্ধ ধর্ম তার পরিপূর্ণ গতি এবং শক্তি লাভ

করেছিল এবং বিশাল নদীর দ্রুত প্রবাহমান স্রোতের মতো পূর্বের দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করেছিল।

৩
মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীনই প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। একারণে, ভারতবর্ষ হতে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের কথা বলতে গেলে সিল্ক রোডের কথা বলতে হয়। এই সড়ক মধ্য এশিয়ার সীমারেখাহীন সীমান্তের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ও পূর্বকে সংযুক্ত করেছে। হান রাজবংশের রাজা উ (king Wu) এর আমলে (খৃষ্টপূর্ব ১৪০-৮৭) এই বাণিজ্য সড়ক ছিল উন্মুক্ত। ঐ সময়ে হান রাজত্ব সুদূর পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং এর ফলে সংযুক্ত দেশ সমূহ যেমন-ফারঘানা, শোকডিয়ানা, তুখারা, এবং এমনকি পার্থিয়া বা পূর্বে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের (Alexander the Great) বাণিজ্যতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; যা তৎসময়েও প্রচুর পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল। এই পুরাতন রাস্তা যা ঐ সমস্ত দেশের মধ্য দিয়ে সিল্ক আনা-নেয়া হতো, সেখানে উক্ত সিল্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এতে পরবর্তীতে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হলো সিল্ক রোড। খৃষ্টাব্দ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে অথবা পরে, ভারত এবং চীন এই বাণিজ্যিক রাস্তাটিকে ভিত্তি করে তাদের দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু করেছিল। অতএব, এই রাস্তাটিকে বৌদ্ধ ধর্মের রাস্তা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

৪
চীন

চীনে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস শুরু হয়েছিল মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং এর অনুবাদ গ্রন্থকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে। আদিকাল থেকে এই পুরানো গ্রন্থগুলোকে চাইনিজ ভাষায় "Ssu-shih-er-chang-ching" বা ৪২ সেকশনের সূত্র, যা বুদ্ধ দ্বারা ভাষিত বলে বলা হতো। তা কাশ্যাপমাতঙ্গ এবং অন্যান্যদের দ্বারা, ইং পিং

(Ying-p'ing 58-76 A.D.) রাজবংশের পূর্বাঞ্চলীয় রাজা মিং (King Ming) এর সময়ে অনুবাদিত হয়। কিন্তু বর্তমানে তা একটি সন্দেহমূলক রূপকাহিনী বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে An-shih-kao কে সামগ্রিকভাবে স্বীকার করা হয়। তিনি ১৪৮ থেকে ১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত Lo-yang এ অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ঐ সময়কাল থেকে উত্তরাঞ্চলীয় Sung Dynasty (৯৬০-১১২৯খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই অনুবাদের কাজ ১০০০ (এক হাজার) বৎসরের কাছাকাছি পর্যন্ত চলমান ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথমবর্ষের দিকে, যাঁরা ধর্মগ্রন্থ ও এগুলোর অনুবাদ কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং প্রচার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলতঃ মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ভিক্ষুরাই। উদাহরণ স্বরূপ, An-shih-kao যাঁর নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি Parthia থেকে এসেছিলেন। তেমনিভাবে K'ang-seng-k'ai সমরখন্দ থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে Lo-yang এ এসেছিলেন, যিনি পরবর্তীতে "সুখাবতীব্যুহ" (অসংখ্য জীবন সম্পর্কিত বই) নামক বইটি অনুবাদ করেছিলেন। অধিকন্তু, Chu-fa-hu বা ধর্মরক্ষা, যিনি "সদ্ধর্মপুন্ডরীক" সূত্র অনুবাদ করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি এসেছিলেন তুখার থেকে। তৃতীয় শতাব্দীর শেষাংশ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত তিনি Lo-yang এ অবস্থান করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন কুচ্ছা হতে কুমারজীবের আগমন ঘটে তখন চীনের অনুবাদকর্ম লক্ষণীয় স্থানে পৌঁছে।

ঐ সময় হতেই সাংস্কৃত শিক্ষা লাভের জন্য চীন থেকে ভারতে ভিক্ষুদের আগমন ঘটে। এই ভিক্ষুদের মধ্যে অন্যতম হলেন Fa-hsien (৩৩৯-৪২০? খৃষ্টাব্দ)। তিনি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের উদ্দেশ্যে Ch'ang-an ত্যাগ করেন এবং পনের বৎসর পর দেশে ফিরে আসেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভারত গমনকারী ভিক্ষু হলেন Hsuan-chuang (৬০০-৬৬৪ খৃষ্টাব্দ), যিনি ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত গমন করেন এবং সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর পর ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। অধিকন্তু, I-ching (৬৩৫-৭১৩ খৃষ্টাব্দ) সমুদ্র পথে ৬৭১ সালে ভারত গমন করেন এবং একই পথে পচিঁশ বৎসর পর দেশে ফিরে আসেন।

এসকল ভিক্ষুগণ নিজেরা ভারত গমন করেছিলেন সাংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্যে। তাঁরা যেসব ধর্মগ্রন্হ পছন্দ করেছিলেন তা নিয়ে গিয়ে অনুবাদ কর্মে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন। Hsuan-chuang অনুবাদ কর্মে ভাষাগত যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা ছিল সত্যিই চমকপ্রদ। তাঁর কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে চীনে ধর্মগ্রন্হের অনুবাদ সর্ব্বোচ্চ গতিশীলতা লাভ করেছিল। কুমারজীবের তত্ত্বাবধানে পরবর্তীকালে যে অনুবাদগুলো হয়েছিলো ওগুলোকে "পুরাতন অনুবাদ" বলে ধরে নেয়া হতো এবং Hsuan-chuang ও তাঁর পরবর্তী সময়ে যে অনুবাদগুলো হয়েছিলো ঐগুলোকে "নতুন অনুবাদ" হিসেবে বৌদ্ধ পন্ডিতগণ পরবর্তী সময়ে ধরে নেন।

সাংস্কৃত ভাষার উপর ভিত্তি করে তখন যে বিপুল পরিমাণ গ্রন্হ অনুবাদ হয়েছিল, তা ঐ পন্ডিত লোকদের চিন্তাধারা এবং ধর্মীয় কার্যাবলীর সাথে ধারাবাহিকভাবে এক শক্তিশালী মিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে। যা স্বাভাবিকভাবে এক সময় গোষ্টিবদ্ধতা, প্রয়োজনীয়তা ও আত্নবিশ্বাসে রূপ নিয়েছিল। প্রথম দিকের ভিক্ষুরা অনাত্মা থেকে তাঁদের মনকে বস্তু ও সৃষ্টির দিকে নিবদ্ধ করলেন। এদের মধ্যে যাঁরা সূত্রের প্রজ্ঞা দ্বারা আকৃষ্ট তাঁরা সুস্পষ্টভাবে ঐ ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা তথাকথিত "হীনযান" বা অপেক্ষাকৃত ছোট গাড়ী থেকে "মহাযান" বা বড় গাড়ীর দিকে তাঁদের মনোযোগকে চালিত করেছিলেন। অধিকন্তু, এই প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে স্বতন্ত্র তেনদাই নিকায় (Tendai) নামে রূপ গ্রহণ করে এবং বলা যায় তা সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে, যখন জেন নিকায়ের (Zen) আবির্ভাব ঘটে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ের দিকে তেনদাই নিকায় (Tendai) চীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তেনদাই (Tendai) নিকায়ের তৃতীয় প্রধান ধর্মগুরু তেনদাই ডাইসি (Tendai Daishi), চি-ই (Chih-i) (৫৩৮-৫৯৭ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধের শিক্ষার পাঁচটি সময়ের সমালোচনামূলক শ্রেণীবিভাগ এবং আটটি মতবাদ এই মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যা সুদীর্ঘকাল ধরে চীনে এবং পাশাপাশি জাপানেও

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ধরে রেখেছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চীনে বিভিন্ন সূত্রাবলীর আনয়নের মধ্যে এর উৎপত্তিকালীন সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি এবং সে সময়ে যা আনা হয় তাই অনুবাদ করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক সূত্রাবলীর মধ্যে কোনটি আদি, তা মূল্যায়ন করা বিরাট এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন এবং একটি অন্যটির সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা বুঝা একসময়ে খুবই জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূত্রাবলীকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে চৈনিক চিন্তাধারার প্রবণতাটি প্রথমত সামনে এসে যায়। সর্বোপরি, Chih-i ছিলেন অধিকতর ধারাবাহিক এবং বিপুলভাবে প্রভাবশালী। কিন্তু, আধুনিক যুগে বৌদ্ধ গবেষণামূলক কাজের মুখে, এমনকি এরূপ শক্তিশালী প্রভাবও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

চীনের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে "যা শেষে আগমন করেছিল" তা ছিল জেন নিকায়। এই নিকায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদেশী শ্রমণ বোধিধর্মের (৫২৮ খৃষ্টাব্দ) নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন তার ফুল প্রস্ফুটিত হয় Hui-neng (৬৩৮-৭১৩ খৃষ্টাব্দ) এর পরবর্তী সময় হতে, যিনি ছিলেন ষষ্ঠ ধর্মগুরু। অষ্টম শতাব্দীর পরে, জেন নিকায় তাঁদের অনেক মেধাবী ভিক্ষুদেরকে কয়েক শতক ধরে প্রচারে পাঠিয়েছিলেন।

দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল, যা চীনা জনগণের সাধারণ স্বভাবে গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মই চীনা জনগণের চিন্তা-চেতনাকে নানা রং এ রন্জিত করছে। এখনও পর্যন্ত বুদ্ধ গৌতমের শিক্ষার দ্রুত প্রবাহ, চলমান সতেজ স্রোতস্বিনীর সংযুক্তির ভিতর দিয়ে অদ্যাবধি বৃহত্তর নদীতে রূপ নিচ্ছে এবং পূর্বের দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করছে।

৫
জাপান

জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস শুরু হয় ৬ষ্ঠ শতকের দিকে। ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজা

Paikche (বা কুদারা, কুরিয়া) সম্রাট Kinmei এর রাজকীয় দরবারে বুদ্ধ মুর্তি ও সূত্রাবলী উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। ইহাই এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ১৪০০ বৎসর পুরানো।

এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে জাপানি বৌদ্ধ ধর্মকে তিনটি পর্যায়ের সংযোগ সূত্রে আমরা ভাবতে পারি। প্রথম পর্যায়ে সাধারণত সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্মকে ধরা যেতে পারে। একে বস্তুগতভাবে প্রকাশ করতে হলে Horyuji প্যাগোডা (৬০৭ খৃষ্টাব্দ) এবং Todaiji প্যাগোডাকে (৭৫২ খৃষ্টাব্দ) উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়, যা ঐ সময়কালেই তৈরী হয়েছিল। এই সময়ের পূর্বে দৃষ্টিপাত করলে, যে বাস্তবতাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা তা হলো ঐ সময়ে সংস্কৃতির প্রবাহ সমগ্র এশিয়া জুড়ে অস্বাভাবিক মাত্রায় দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন পশ্চিমা সভ্যতা তিমির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পূর্বের দেশগুলো আশ্চর্য সক্রিয়তায় এবং উল্লেখযোগ্য আলোড়নের ভিতর দিয়ে উন্নত হচ্ছিল। চীনে, মধ্য এশিয়ায়, ভারতে এবং দক্ষিণ সাগর তীরবর্তী দেশগুলো বুদ্ধিভিত্তিক, ধর্মীয় এবং চারুকার্য ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতার সাথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিল। উল্লেখিত উৎকর্ষতা যুক্ত হয়ে, বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ববিশ্বের দেশগুলোকে মানবতার উদ্ভাসিত স্রোতে স্নাত করে দিয়েছিল। এই নতুন উৎকর্ষতা অত্যুৎকৃষ্ট Horyuji প্যাগোডা এবং চমকপ্রদ Todaiji প্যাগোডার গঠন শৈলীর মাধ্যমে অবলোকন করা গিয়েছিল এবং যার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় এবং চারুকলার বিকাশ ঘটে ছিল তা পূর্বের দেশগুলোর সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রবাহের ধারণ ক্ষমতাকেই ইঙ্গিত করে যা মূলত এশিয়ার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল।

এই দেশের জনগণ, যারা সুদীর্ঘকাল ধরে একটি দেশ হিসেবে সভ্যতার আলো থেকে পিছিয়ে পড়েছিল, বর্তমানে তারা ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে স্নাত হচ্ছে। বলা যায়, সভ্যতা নামক পুষ্প হঠাৎ করে তাদের কাছে সবকিছুই উন্মোচিত করেছে। সৌভাগ্যের মসৃণ চাকা এভাবেই ঐ শতাব্দীগুলোতে জাপানকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিল। আর এই উন্নত সাংস্কৃতিক সভ্যতা জাগরণে যে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছিল সে আর কেউ নয় সে হলো বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ বিহারগুলো হয়ে উঠলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং ভিক্ষুরা হয়ে উঠলেন

এই নতুন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান। সেখানে কেবল ধর্মের উন্নতি নয়, বিস্তৃতাকারে এবং ব্যাপকভাবে সংস্কৃতির উন্নতির দিকটিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ইহাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের আসল অবস্থা যা অন্য দেশ হতে এদেশে আগমন করেছিল।

নবম শতাব্দীতে, দু'জন বিশিষ্ট ভিক্ষু Saicho (Dengyo Daishi, ৭৬৭-৮২২) এবং Kukai (Kobo Daishi, ৭৭৪-৮৩৫) আবির্ভূত হন এবং তাঁরা দু'টি নিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন, দু'টিকে একত্রে Heian-Buddhism হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ইহা ছিল জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক সংস্থাপন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মকে এর আদি সঠিক শিক্ষার আলোকে গ্রহণ করেন এবং অনুশীলনে নিবিষ্ট হন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে Mt. Hiei এবং Mt. Koya তে স্ব স্ব নিকায়ের বিহার স্থাপন করেন। এই দু'টি বিহার প্রতিষ্ঠার ৩০০ বৎসর পরে, এবং Kamakura যুগ পর্যন্ত এই দু'টি নিকায়, Tendai এবং Shingon প্রধানতঃ অভিজাত ব্যাক্তিবর্গের কাছে এবং সম্রাটদের কাছে সমাদৃত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো, ১২ শতাব্দী থেকে ১৩ শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্ম। সে সময়ে আবির্ভূত হওয়া বিশিষ্ট ভিক্ষুদের মধ্যে রয়েছেন Honen (১১৩৩-১২১২ খৃষ্টাব্দ), Shinran (১১৭৩-১২৬২ খৃষ্টাব্দ), Dogen (১২০০-১২৫৩), এবং Nichiren (১২২২-১২৮২ খৃষ্টাব্দ) অন্যতম। যখন আমরা জাপানের বৌদ্ধ ধর্মের কথা আলোচনা করি, তখন উল্লেখিত বিশিষ্ট ভিক্ষুদের নাম উল্লেখ না করে পারি না। তাহলে কেনই বা শুধু ঐ শতাব্দীগুলোতে আবির্ভূত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে ? এর কারণ ঐ সময়ে তাঁরা সকলেই একটা সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাহলে সে সাধারণ সমস্যাটি কি ছিল ? খুব সম্ভবত তা হলো, বৌদ্ধ ধর্ম যদিও জাপানী সমাজে সহজে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তা হয়েছিল একটি স্বতন্ত্র জাপানী পদ্ধতিতে।

ইহা অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, "কেন ? ইহা কি সত্যি নয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম ঐ সুদীর্ঘ সময়েরও পূর্বে এদেশে সূত্রপাত হয়েছিল ?" ইহাই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু এ নতুন আমদানিকৃত ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে, পূর্ণতাদান করতে, ও নিজেদের

মত করে গ্রহণ করতে এদেশের লোকদের কাছে কয়েকশত বৎসর লেগে গিয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মকে এদেশের মানুষদের গ্রহণ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল, এবং এসকল প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে, বার ও তের শতকের বৌদ্ধদের কাছে এই ধর্ম বিকশিত হয়েছিল।

অতঃপর, জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখিত বিশিষ্ট ভিক্ষুদের দ্বারা ভিত্তি স্থাপনের পর অদ্যাবধি এর গতিধারা বজায় রেখে স্বগর্বে অগ্রসর হচ্ছে। ঐ বিশিষ্ট ভিক্ষুদের আগমনের পর, জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের জগতে পুনরায় অনুরূপ মেধার আগমন ঘটেনি। তথাপি, বর্তমান লেখক মনে করেন সেখানে অন্য একটি বিষয় বিদ্যমান যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা হলো বর্তমান সময়ে মূল/আদি বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা মূলক কার্যাবলীর ফসল।

জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম সামগ্রিকভাবে, ইহার গ্রহণকালীন সময় থেকে, মহাযান মতাদর্শ সম্পন্ন। ইহা চীনের বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষতঃ বার ও তের শতাব্দীতে বিশিষ্ট ভিক্ষুদের আগমনের পর, মহাযান শিক্ষা এর স্বতন্ত্র ধর্মীয় নিকায় কর্তৃক ভিত্তি স্থাপনের ভেতর দিয়ে প্রধান গতিপথটি সৃষ্টি হয়েছিল, যে দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এভাবে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে, মূল/আদি বৌদ্ধ ধর্মের গবেষণা শুরু হয়েছিল, Meiji যুগের মাঝামাঝি সময়ের পরের দিক থেকে। বুদ্ধ গৌতমের শিক্ষাদর্শের মূল স্বরূপ তখন সুস্পষ্টভাবে তাদের সম্মুখে পুনঃ উপস্থিত হয়েছিল। তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, নিকায় প্রতিষ্ঠাতাকারীদের বাইরেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। আবার, যারা এতদিন মহাযান শিক্ষার বাইরে অন্য কিছুকে ভাবতে পারেনি, তাদেরকেও বুঝতে সক্ষম করে তুলেছিল, এ ধারাবাহিক মহাযান শিক্ষার বাইরেও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা বিদ্যমান আছে। এসকল নতুন উন্নয়নগুলো এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং যা এখনও সাধারণ জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টির মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এদেশের জনগণ বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। লেখক এ পর্যায়ে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে চান, যা উপরে বর্ণিত তিনটি ধারার তৃতীয়টি বা তৃতীয় ধারার শেষোক্তটি হিসেবে ধরা যাবে।

বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার মিশন

বৌদ্ধ ধর্ম হলো শাক্যমুণি বুদ্ধ ৪৫ বৎসর যাবৎ যা প্রচার করেছেন তা; যাকে আমরা ধর্ম বলে থাকি। এ শিক্ষাগুলো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী। সুতরাং, তিনিই এই ধর্মের সর্বেসর্বা। অপরপক্ষে, বুদ্ধের ধর্ম ৮৪০০০ (চুরাশি হাজার) ধর্মস্কন্ধ ও অনেক নিকায়ের সমন্বয়ে গঠিত, যার সবগুলোই শাক্যমুণি বুদ্ধের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। যে গ্রন্হগুলোতে বুদ্ধের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তাকে *Issaikyo* বা *Daizokyo* বলে বলা হয়, যা পবিত্র শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ।

শাক্যমুণি জোরালোভাবে মানুষের সমতার পক্ষে কথা বলেছেন এবং তিনি তাঁর শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খুবই সহজ সরল ভাষায় উপস্হাপন করেন, যা সকলেই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষের বহুমুখী উপকারিতার কথা ভেবে মহাপরিনির্বাণ লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধর্ম প্রচারে নিবিষ্ট ছিলেন।

শাক্যমুণি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর, তাঁর শিষ্যগণ যেভাবে ঐ শিক্ষা শ্রবণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে এই পবিত্র শিক্ষা প্রচারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গিত করেছিলেন। তবুও যেহেতু ঐ শিক্ষা স্হানান্তরিত হয়েছে এবং পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, সেহেতু সেখানে শিষ্যদের অসচেতনতার দরুন কিছুটা ভিন্নতা উপস্হাপন হতে পারে; যা তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন বা শুনেছেন বা বুঝেছেন। কিন্তু শাক্যমুণির শিক্ষা অবশ্যই সর্বদা সংক্ষিপ্ত এবং যথার্থভাবে স্হানান্তরিত হয়েছিল যা সবার জন্য পক্ষপাতহীনভাবে শ্রবণ করার সুযোগ ছিল। পরবর্তীকালে অনেক বড় ভিক্ষুরা একত্রিত হয়ে বুদ্ধের বাক্য এবং শিক্ষাকে মিলিয়ে দেখার জন্য এবং পুর্নবিন্যাসের দ্বারা শক্তিশালী করার জন্য, যেগুলো পারস্পরিকভাবে মিলে যায় ঐগুলোকে একই চিন্তাভুক্ত করে তাঁরা শুনেছেন। তাঁরা অনেক মাস কাল এই আলোচনা চালিয়ে-ছিলেন। তাঁদের ঐ কাজগুলোকে সঙ্গায়ণ বলে অভিহিত করা হয়। এসকল সঙ্গায়ণ এটিই প্রমাণ করে যে তাঁরা কিভাবে আন্তরিকতা ও ত্যাগের মাধ্যমে মহান গুরুর

প্রকৃত বাণীকে প্রচার করতে সচেষ্ট ছিলেন।

যে শিক্ষাগুলো বিন্যস্ত করতে পেরেছিলেন সেগুলো লিখতে দেয়া হলো। যে শিক্ষাগুলোকে লিখিত আকারে তালিকাবদ্ধ করা হলো, সেগুলোর সাথে পরবর্তীতে অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মতামত এবং ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়। সেগুলো *Ron* বা অর্থকথা বলে পরিচিত হয়ে আসছে। "বুদ্ধের শিক্ষা" এই বইটিও পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত করা একটি মতামত সম্বলিত গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মের সব গ্রন্থগুলোকে একসাথে *Sanzokyo* (বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থাবলীর তিনটি অংশ) বা সংস্কৃত ভাষায় তাকে ত্রিপিটক বলা হয়।

Sanzokyo বা ত্রিপিটক গ্রন্থে *kyozo, Ritsuzo* এবং *Ronzo* বিদ্যমান। *Zo* শব্দের অর্থ হলো পাত্র বা আঁধার। *Kyo* এর অর্থ হলো বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী, এবং *Ritsu* মানে বৌদ্ধ ভ্রাতৃসংঘের নিয়ম প্রণালী। *Ron* মানে বিশিষ্ট ভিক্ষুদের দ্বারা লিখিত মতামত সম্বলিত গ্রন্থ।

ঐতিহ্যগতভাবে, পরবর্তী পূর্বাঞ্চলীয় Han যুগের (২৫-২২০ খৃষ্টাব্দ) রাজা Ming এর সময়ে ৬৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে সূত্রপাত হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ৮৪ বৎসর পরেই বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী এবং অনুবাদ একই যুগের রাজা Huan (১৫১ খৃষ্টাব্দ) এর সময়ে চীনে পরিচিতি লাভ করে। অতঃপর প্রায় ১৭০০ বৎসর পর চীনা ভাষায় ধর্ম গ্রন্থ অনুবাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ঐ অনুবাদিত ধর্ম গ্রন্থের সংখ্যা ১৪৪০টি এবং তা ৫৫৮৬ খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম গ্রন্থ অনুবাদের এ ধারা Wei যুগের প্রথম দিক থেকে অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু তা উত্তরাঞ্চলীয় Sung যুগেই ছাপানোর কাজ শুরু হয়েছিল। যাহাই হউক না কেন, এই সময় থেকে চীনের বিশিষ্ট ভিক্ষুদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলী মূল ধর্ম গ্রন্থের সাথে সংযোজিত হয় এবং এর পর থেকে এ ধর্মগ্রন্থগুলোকে আর ত্রিপিটক বলা যুক্তি সঙ্গত নয়। যখন Suei যুগ শুরু হয়, তখন *Issaikyo* বা সমগ্র সংগৃহীত লিখিত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলো, Tang যুগে নতুন নামকরণ করে *Daizokyo* বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সমগ্র সংগ্রহ নামে বিনয় এবং সূত্র হিসেবে সংরক্ষিত রাখা হয়।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত হয় ৭ শতাব্দীর দিকে। ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত মোট ১৫০শ বৎসর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। বস্তুতপক্ষে সবই অনুবাদিত হয়েছিল সে সময়েই।

প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ধর্মগ্রন্থগুলো শুধু কুরিয়ান, জাপানীজ, শ্রীলংকান, কম্বোডিয়ান, তার্কিশ ভাষায় অনুবাদিত হয়নি, প্রায় সব এশিয়ান দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। আবার ল্যাটিন, ফ্রান্স, ইংরেজী, জার্মান এবং ইতালীয়ান ভাষায়ও তা অনুবাদিত হয়েছে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বুদ্ধের শিক্ষার মহিমা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রসারতা লাভ করেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তা, যা ২,০০০ বৎসরেরও বেশী সময়ের মধ্যে অনুবাদিত গ্রন্থের মানের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় উন্নতির ইতিহাস; এবং ১০,০০০ হাজারেরও বেশী গ্রন্থের লেখা হতে, শাক্যমুণি বুদ্ধ যা বলেছেন তার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা বর্তমানে কঠিন। এমন কি Daizokyo এর সাহায্য নিয়েও তা উপলব্ধি করা কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং, তাই Daizokyo হতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চয়ন করা অপরিহার্য এবং এগুলোর বিবেচনা ও মানের উপর ভিত্তি করে যে কোন কেহ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করতে পারেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষার মূল কর্তৃপক্ষ হলেন শাক্যমুণি বুদ্ধ নিজেই। এই কারণে, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি ও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। অন্যথায়, এটি বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীর বিশ্বাসে মানব মনকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হবে। এই অর্থে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা হবে একটি, যা আমরা আমাদের নিজেদের মত করে তৈরী করতে পারবো। ইহা সহজ ও সরল হওয়া কাম্য। এর গুণগতমান হবে পক্ষপাতহীন। সম্পূর্ণ শিক্ষাকে যথাযোগ্যভাবে উপস্হাপন করা, যাতে করে সঠিক এবং প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবো।

উপরে আলোচিত বিষয়ের কথা বিবেচনায় রেখে আমরা এই গ্রন্হটি, ২০০০ বৎসরেরও বেশী পুরানো ঐতিহাসিক গ্রন্হ Daizokyo উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত

ধারায় প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য, এই প্রকাশনার সারমর্ম সম্পূর্ণ উক্ত গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষা অর্থগতভাবে খুবই গভীর এবং তাঁর গুণাবলী অফুরন্ত যা কেউ সহজভাবে প্রশংসা করে শেষ করতে পারে না।

সুতরাং, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, ভবিষ্যতে এই বইটি পুর্নমুদ্রনের সময়ে আরও বেশী সত্যনিষ্ঠ ও মূল্যবান বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উৎকর্ষসাধন করে প্রকাশ করা।

বুদ্ধের শিক্ষার ইতিহাস

এই বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থটি পুনর্বিবেচনাপূর্বক জাপানী সংস্করণ, বৌদ্ধ সাহিত্যের নতুন অনুবাদের উপর ভিত্তি করে সংকলন করা হয়েছে, যা ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে Rev. Muan Kizuর তত্ত্বাবধানে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের নতুন অনুবাদ ও প্রসার নামক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রথম জাপানী সংস্করণ সংকলন করেছিলেন অধ্যাপক Shugaku Yamabe এবং অধ্যাপক Chizen Akanuma তথা আরো অনেক জাপানী পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা, যা প্রকাশ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৫ বৎসর। Showa যুগে (১৯২৬-), বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থের নতুন জনপ্রিয় সংস্করণ উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করে সমগ্র জাপানে প্রচার করা হয়।

১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে যখন জাপানে বিশ্ব বৌদ্ধ যুব সংস্হার সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র জাপান বৌদ্ধ যুব মৈত্রী সংঘের মাধ্যমে, বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থের নতুন জনপ্রিয় সংস্করণটি বুদ্ধের শিক্ষা নামে Mr. D. Goddard এর সহযোগিতায় সংগঠনের কার্যক্রম হিসেবে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়। ১৯৬২ সালে, Mr. Yehan Numata, যিনি Mitutoyo যৌথ সংস্হার প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক আমেরিকায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ৭০তম স্মারক বার্ষিকীতে "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ সালে, Mr. Numata যখন টোকিওতে বৌদ্ধ ধর্ম উন্নয়ন সংস্হা গঠন করেন, তখন থেকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় "বুদ্ধের শিক্ষা" নামক ইংরেজী সংস্করণ বইটি সংস্হার কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত হয়ে সুচারুরূপে প্রচারিত হয়ে আসছে।

ইংরেজী ভাষার জগতে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, ১৯৬৬ সালে "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি সংশোধন-সংযোজনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যগণ হলেন, অধ্যাপক Kazuyoshi Kino, Shuyu Kanaoka, Zenno Ishigami, Shinko Sayeki, Kodo Matsunami, Shojun Bando, এবং Takemi Takase অন্যতম। তাছাড়াও অধ্যাপক Fumio Masutani, Mr. N. A. Waddell, এবং Mr. Toshisuke Shimizu ও এই কমিটিতে সদস্যভুক্ত ছিলেন। অতঃপর, আধুনিক চিন্তা ধারার আলোকে বর্তমানের এই জাপানীজ-ইংরেজী সংস্করণ "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালে এই জাপানীজ-ইংরেজী সংস্করণের উপর ভিত্তি করে, অধ্যাপক Shuyu Kanaoka, Zenno Ishigami, Shoyu Hanayama, Kwansei Tamura, এবং Takemi Takase ইংরেজী সংস্করণের একটি সংকলন একই বৎসর প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে, অধ্যাপক Ryotatsu Shioiri, Takemi Takase, Hiroshi Tachikawa, Kwansei Tamura, Shojun Bando, এবং Shoyu Hanayama (প্রধান সম্পাদক) হিসেবে পুনঃ জাপানি ভাষায় "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি সংকলন করে, ১৯৭৩ সালে তা প্রকাশ করেন।

পুনরায়, ১৯৭৪ সালে, অধ্যাপক Kodo Matsunami, Shojun Bando, Shinko Sayeki, Doyu Tokunaga, Kwansei Tamura, এবং Shoyu Hanayama কে প্রধান সম্পাদক করে, "বুদ্ধের শিক্ষা" ইংরেজী সংস্করণটি Mr. Richard R. Steiner এর সহযোগিতায়, পুনঃ পর্যালোচনার মাধ্যমে সংকলন করা হয়। ইহা জাপানি সংস্করণ সম্বলিত ছিল (১৯৭৩ সালে প্রকাশিত)। ফলে

"বুদ্ধের শিক্ষা" বইটির জাপানি-ইংরেজী সংস্করণটি বর্তমান অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, অধ্যাপক Shigeo Kamata এবং Yasuaki Nara কে সংকলন কমিটির সদস্যভুক্ত করে, আধুনিক সমাজে এই বইটির অর্ন্তস্পর্শী আবেদন নিশ্চিত করে বার্ষিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, এবং এই মহৎ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মে, ১৯৮৬

বুদ্ধের শিক্ষা গ্রন্থের অনুক্রমণিকা

মানব জীবন	**পৃষ্ঠা নং**	**লাইন**
জীবনের অর্থ	5	3
এ পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থান	80	20
আদর্শ জীবন যাত্রা	209	9
মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন জীবন	39	21
জীবনের সঠিক ধারণা	36	20
জীবনের প্রতিকূল ধারণা	50	1
মোহ পরায়ণ ব্যক্তিগণ (পৌরাণিক কাহিনী	104	23
এক ব্যক্তির জীবন (পৌরাণিক কাহিনী)	75	22
যদি কেহ লোভ ও দ্বেষপূর্ণ জীবন যাপন করে (পৌরাণিক কাহিনী)	75	10
বয়স, রোগ ও মৃত্যু আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে পারে ? (কাহিনী)	78	9
মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (কাহিনী)	79	5
পাঁচটি জিনিস এ পৃথিবীতে কেহই অর্জন করতে পারে না	42	20
এই পৃথিবীর চারটি সত্য	43	6
মোহ ও সর্বজ্ঞতা উভয়েই মনের মধ্যেই উৎপন্ন হয়	43	18
২০টি জিনিস খুবই কঠিন কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে অর্জন করা খুবই মূল্যবান	109	18
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস		
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হলো আগুনের ন্যায়	146	13
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	147	18
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা	148	18

অকৃত্রিম মনে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়	148	2
সত্যকে দর্শন করা কঠিন যেমন অন্ধলোক হাতীকে স্পর্শ করে তার আসল রূপ বর্ণনা করার ন্যায় (পৌরাণিক কাহিনী)	63	12
বুদ্ধের প্রকৃত রূপ কোথায় অবস্হান করছে তা তাঁর সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে দর্শন করা যায় (পৌরাণিক কাহিনী)	65	14
বুদ্ধের রূপ প্রচণ্ড আবেগের মাঝেই লুকায়িত (পৌরাণিক কাহিনী)	62	9
সন্দেহ, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসকে ব্যাহত করে	149	2
বুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের পিতা সদৃশ আর মানুষেরা হলো তাঁর সন্তান/সন্ততি সদৃশ	31	7
বুদ্ধের প্রজ্ঞা মহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত	30	3
বুদ্ধের প্রতিভা মহা করুণায় পরিপূর্ণ	13	1
বুদ্ধের করুণা চিরন্তন	14	1
বুদ্ধের কোন রূপ কায়া নেই	11	5
বুদ্ধ তাঁর সারা জীবন ধর্ম দেশনা করেছিলেন	20	8
বুদ্ধ মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে জন্ম-মৃত্যুকে অলীক কাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতেন	20	8
বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে জনগণকে দুঃখ থেকে রক্ষা করতেন	16	12
বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে জনগণকে দুঃখ থেকে রক্ষা করতেন	17	5
সর্বজ্ঞতার জগত	210	19
বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের অনুসারী হওয়া	145	11
কিভাবে শীল রক্ষা করতে হয়, মনকে সমহিত করা হয় এবং বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা করা	133	18
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ	136	5
সর্বজ্ঞতার অন্য স্তরে পৌঁছার ৬টি উপায়	137	19
চার প্রকার সম্যক প্রচেষ্টার প্রণালী	137	9

৪টি বিবেচ্য বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে	137	3
সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে পঞ্চস্কন্ধ শক্তি	137	15
মনের চার প্রকার সীমহিন অবস্হা	139	23
যাঁরা চারি আর্য সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন	35	9
মানুষের মৃত্যু ও অস্হায়ী জীবন	11	5
যাঁরা বুদ্ধ অমিতাভের নাম স্মরণ করবেন তাঁরা তাঁর শুদ্ধাবাসে জন্ম গ্রহণ করবেন	94	2
নিজেকে একটি আলো হিসেবে তৈরী কর, নিজের উপর বিশ্বাস স্হাপন কর	9	3
মানসিক প্রশিক্ষণ		
নিজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি তা নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে (রূপক কাহিনী)	123	7
তোমার প্রথম পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন কর	109	14
তুমি যা অনুসন্ধান কর তা ভুলে যেও না (রূপক কাহিনী)	124	17
যে কোন কিছুতে সফলতা অর্জন করতে হলে, অনেক পরিশ্রম সহ্য করতে হয় (কাহিনী)	129	18
নিজেকে দৃঢ়তার সাথে রক্ষা কর, বারংবার পরাজিত হওয়ার পরেও (কাহিনী)	141	6
অসন্তোষজনক অবস্হায়ও তোমার মনকে অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে না (কাহিনী)	102	11
যাঁরা আর্য সত্যকে বুঝে ও অনুশীলন করে তাঁরা অন্ধকারে আলো নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ন্যায়	36	1
এক জন লোক যেখানেই যাবে না কেন, সে মানবীয় জীবনে বুদ্ধের শিক্ষাকে খুঁজে পাবে (কাহিনী)	132	8
মানুষেরা তাদের মন যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকে গমন করে	100	15
বুদ্ধের শিক্ষার আলোচ্য বিষয় হলো নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা	9	15

প্রথমে তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ কর	176	1
যদি তুমি তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ কর	100	19
মনের বিভিন্ন স্তর (পৌরাণিক কাহিনী)	98	2
অহঙ্কার মনের বৈশিষ্ট্য নয়	41	12
তোমাকে প্রভাবিত করার দায়িত্ব মনকে দেবে না	9	8
তোমার মনকে জয় কর	126	10
তোমার মনের শিক্ষক হও	10	6
শরীর, মুখ ও মন থেকেই সকল অকুশল নিঃসৃত হয়	72	21
মন ও বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক	103	15
এই দেহ কিছুই নয় কিন্তু একটি ধার করা জিনিস (কাহিনী)	118	3
এই দেহ সকল প্রকার অশুভ পদার্থে পরিপূর্ণ	107	21
কোন জিনিসের প্রতি লালসা গ্রস্হ হবে না	9	8
দেহ, মুখ ও মনকে পবিত্র রাখ	102	1
পক্ষপাতহীন হও ও দৃঢ়তার সাথে পরিশ্রম কর (কাহিনী)	140	16
মানবীয় দুঃখ		
মানবীয় দুঃখের উৎপত্তি আসক্তিপরায়ণ মন হতে	38	6
দুঃখকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়	11	14
মোহ ও অবিদ্যা হতে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে প্রবেশ	51	23
কিভাবে দুঃখরূপ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করা যায়	96	1
যখন প্রচণ্ড আবেগের আগুন দূরীভূত হয়, তখন নূতন তেজ দীপ্ত সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন হয়	117	2
কামভাব মোহের উৎস স্বরূপ	71	16
কামভাব সম্পর্কে চিন্তা করা মানে ফুলের মধ্যে লুকায়িত সর্পের ন্যায়	71	20
জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে কোন প্রকার আসক্তি থাকে না (পৌরাণিক কাহিনী)	17	1
অকুশলের উৎস প্রচণ্ড আবেগ	97	19
এ বিশ্ব আগুনে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে	69	8

যদি মানুষেরা খ্যাতি ও সম্মানের পেছনে ধাবিত হয়, ইহা তাদেরকে প্রজ্জ্বলিত করার ন্যায়	98	18
যদি কোন লোক লোভের বশবর্তী হয়ে সম্পদের পেছনে দৌড়ে, সে নিজেকে ধ্বংস করে	98	23
বিজ্ঞ ব্যক্তি ও মূর্খ ব্যক্তি তাদের মৌলিক স্বভাবের দ্বারা ভিন্ন	110	22
বোকা লোকেরা তাদের ভুল সম্পর্কে সজাগ নয় (পৌরাণিক কাহিনী)	116	10
বোকা লোকেরা অন্যলোকদের শুধু ফলের মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শন করে ঈর্ষান্বিত হয় (পৌরাণিক কাহিনী)	116	15
যে পথে এক জন বোকা লোক কাজ করতে উপযুক্ত মনে করে (পৌরাণিক কাহিনী)	121	2
প্রাত্যহিক জীবন		
দান দেয়া ও এগুলোর কথা ভুলে যাওয়া	138	15
সম্পদ ব্যতীত সাত প্রকারের দান	138	22
সম্পদ লাভের উপায় (কাহিনী)	119	25
কিভাবে সুখ অর্জন করা যায়	109	7
প্রাপ্ত সহৃদয়তাকে কখনও ভুলা যায় না (কাহিনী)	114	21
বিভিন্ন প্রকারের মানুষের বৈশিষ্ট্য	74	14
যে প্রতিশোধ মূলক মনোভাবকে প্রাধান্য দেয় সে সবসময় দুঃভাগ্যের গর্তে পতিত হয়	108	23
বিক্ষুব্ধ মনকে কিভাবে প্রশমিত করা যায় (কাহিনী)	206	9
অন্যের সমালোচনায় উত্তেজিত না হওয়া (কাহিনী)	101	6
তুমি পোষাক, খাদ্য ও বাসস্হানের জন্যে জীবন যাপন করছো না	169	18
খাদ্য ও পোষাক আরাম-আয়েশের জন্য নয়	96	15
খাদ্য গ্রহণ করার সময় কি চিন্তা করতে হয়	172	6
পোষাক পরিধানের সময় কি চিন্তা করতে হয়	171	9

শয্যা গ্রহণ করার সময় কি ভাবতে হয়	172	17
উষ্ণ ও ঠান্ডার সময় কি ভাবতে হয়	172	9
দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবতে হয়	170	17
সরকার		
একটি জাতীয় অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার উপায়	191	16
একজন শাসকের পথ	194	20
একজন শাসক আগে নিজেকে শাসন করবে	192	18
আদর্শ শাসন হলো মানুষের মনকে প্রশিক্ষণ দেয়া	193	18
মন্ত্রী ও পদস্হ ব্যক্তিগণ কিভাবে আচরণ করবেন	197	12
একজন বিচারক কিভাবে অপরাধীর সাথে আচরণ করবেন	196	13
জাতীয় জীবনে ধর্ম শিক্ষার ফলাফল	193	11
সামাজিক সমস্যগুলো কিভাবে সাফল্যের সাথে সমাধান করবে	199	7
অর্থনীতি		
অবশ্যই যথাযথভাবে বস্তুর ব্যবহার করতে হবে (কাহিনী)	184	6
কোন সম্পদই সর্বদা নিজের হতে পারে না	183	18
কোন জিনিস শুধু একা একা জমা করে রাখার জন্য নয়	190	5
কিভাবে সম্পদ অর্জন করা যায় (কাহিনী)	119	25
পারিবারিক জীবন		
পরিবার হলো এমন এক স্হান যেখানে সকল সদস্যদের মন একে অপরের সংস্পর্শে আসে	181	18
যে জিনিস দ্বারা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়	177	3
একজন পিতা-মাতার প্রতি মহা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়	181	12
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের যথাযথ দায়িত্ব ও কতর্ব্য	177	16
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক	178	17
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একই বিশ্বাস থাকা উচিৎ (কাহিনী)	186	19
মহিলাদের জীবন		

চার প্রকার মহিলা	185	8
বিভিন্ন প্রকারের স্ত্রী	187	12
যুবতী স্ত্রীর জন্য শিক্ষা (কাহিনী)	187	6
বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের জন্য সুবিধা	185	22
যুবতী ও সুন্দরী মহিলাদের সুবিধার জন্য	189	2
পুরুষেরা কিভাবে মহিলাদের প্রতি ব্যবহার করবেন	107	13
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	186	14
আদর্শ মহিলার দায়িত্ব ও কর্তব্য	190	2
দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক কিরূপ ?	187	12
গৃহত্যাগী ভ্রাতৃসংঘের পথ		
একজন লোককে গৃহত্যাগী ভ্রাতৃসংঘ বলা যাবে না যদিও সে ভিক্ষু বেশ পরিধান করেন বা সূত্র আবৃত্তি করেন	163	3
গৃহত্যাগী ভ্রাতৃসংঘ বিহার বা বিহারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়	160	1
লালসাপূর্ণ মানুষ প্রকৃত ভিক্ষু হতে পারেন না	160	7
একজন গৃহত্যাগী ব্যক্তির প্রকৃত জীবন ধারণ করা উচিৎ	162	1
সমাজ জীবন		
সমাজ জীবনের অর্থ	202	12
এই পৃথিবীতে সমাজের প্রকৃত অবস্হান	80	20
তিন প্রকারের সংগঠন	202	17
একটি প্রকৃত সমাজ জীবন	203	3
মহান আলো যা অন্ধকারকে আলোকিত করে	201	7
মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে ঐক্য	203	13
যা সামাজিক সংগঠনকে ঐক্যতার মাধ্যমে পরিচালিত করে	204	15
আদর্শ ভ্রাতৃসংঘ	203	20
বৌদ্ধ অনুসারীদের সামাজিক আদর্শ	210	11

যারা আইনকে অমান্য করে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়	115	16
যারা অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও কলহপূর্ণ তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (পৌরাণিক কাহিনী)	115	16
বয়োজেষ্ঠ্যদের সম্মান করা (কাহিনী)	111	9
শিক্ষকের প্রতি তাঁর ছাত্রের কর্তব্য এবং ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব	178	4
বন্ধুত্বের জন্য নীতিসমূহ	179	1
কিভাবে একজন ভাল বন্ধু পছন্দ করবে	180	10
একজন চাকর ও তার মালিক কিভাবে একে অপরকে ব্যবহার করবে	179	10
অপরাধীদের প্রতি আচরণ	190	13
যাঁরা ধর্ম শিক্ষা দেবেন তাঁদের সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে	164	9

সংস্কৃত শব্দকোষ
(বর্ণানুক্রমিক অনুসারে)

অনাত্মা (স্বার্থপরতাহীন)

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই পৃথিবীর সকল অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন প্রকার বাস্তব অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের জন্য ইহা খুবই প্রকৃতিজাত, যা সকল প্রকার অস্তিত্বের অস্থায়ীত্বের পক্ষে কথা বলে, এরূপ অস্থায়ী অস্তিত্বের কারণে মনের মধ্যে কোন প্রকার স্থায়ী অস্তিত্বের এমন বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে না; যা আমি, আমার বলে দৃঢ়ভাবে দাবী করতে পারে। অনাত্মাকে তাই স্বার্থপরতাহীন হিসেবেও অনুবাদ করা যেতে পারে।

অনিত্য (অচিরস্থায়ী বা অস্থায়ী)

ইহা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই পৃথিবীর সকল অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু অবিরামগতিতে পরিবর্তীত হচ্ছে; এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও একই বস্তু হিসেবে বিদ্যমান থাকছে না। সকল বস্তুই ভবিষ্যতে কোন একদিন মৃত্যু বা সমাপ্তির মুখামুখি হবেই। এই অনিবার্য পরিস্থিতিই দুঃখের মূল কারণ। জাগতিক চিরন্তন সত্যের এই ধারণা কেবলমাত্র দুঃখবাদ এবং অবিশ্বাসী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে হবে না, কারণ অনিত্যতা এবং দুঃখ ধর্মীতা এরা উভয়েই অগ্রসরমান ও পুনর্গঠনকারী; যা অবিরামগতিতে পরিবর্তীত হচ্ছে, সেই পরম বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।

বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোরভাবে পরিশ্রমকারী)

মূলতঃ, এই নামটি বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করার পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতমকেই ইঙ্গিত করে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারতা লাভ করার পরে, যাঁরা বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের সকলকে এই নামে ডাকা হয়। পরিশেষে, যাঁরা বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনে অন্যকে সাহায্য করেন এবং একই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে মহাকরুণাজাত কঠোর পরিশ্রম করেন, তাঁদেরকেও প্রতিকীভাবে বোধিসত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বোধিসত্ত্বদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর (Kwannon), স্মৃতিগর্ভ (Jizo), মঞ্জুশ্রীই(Mon-ju) কেবল মাত্র পরিচিত।

বুদ্ধ (যিনি সর্বজ্ঞ)

আসলে, গৌতম সিদ্ধার্থ (শাক্যমুণি) যিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক তাঁকে এই নামে সম্বোধন করা হয়। তিনিই ভারতে ২৫০০ বৎসর পূর্বে, ৩৫ বৎসর বয়সে, বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সাধারণত সকল বৌদ্ধরাই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনই কামনা করে থাকেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে বিভিন্ন পথানুসারে বৌদ্ধরা বিভিন্ন নিকায়ে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে, ঐতিহাসিক শাক্যমুণি বুদ্ধ ছাড়াও, অনেক বুদ্ধের উপস্হিতি বিদ্যমান, যেমন-অমিতাভ (Amitabha, Amida), মহাবৈরোচনা (Dainichi), ভৈষর্য্যগুরু (Yakushi), ইত্যাদিকে, বুদ্ধের শিক্ষার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের Pure Land এর ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মের ধারণায় প্রভাবিত, যে কোন ব্যক্তি Pure Land এ পুনঃর্জন্ম গ্রহণের পরে বুদ্ধ হয়, এই অর্থে যাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন সচরাচর তাঁদের সকলকেই "বুদ্ধ" বলা হয় বা জাপানিতে তাঁদেরকে Hotoke বলা হয়।

ধর্ম (সত্য শিক্ষা)

এই শিক্ষা সর্বজ্ঞ বুদ্ধের দ্বারা ভাষিত হয়েছে। এই শিক্ষা তিন প্রকারের অনুশাসনের সমন্বয়ে গঠিতঃ, যথা-সূত্র, (যে শিক্ষা বুদ্ধ নিজেই দেশনা করেছেন), বিনয়, (বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত নিয়মানুবর্তীতা), এবং অভিধর্ম, (সূত্র এবং বিনয় সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত বা আলোচিত মনোবিজ্ঞান জাতীয় অর্থকথা সমূহ)। এই তিনটিকেই ত্রিপিটক বলা হয়। ধর্ম হলো বৌদ্ধদের কাছে এই তিনটি রত্নের একটি।

কর্ম (কার্য)

যদিও মূলতঃ এই পদের দ্বারা সহজভাবে "কার্য"কে বুঝায়, কিন্তু এর সাথে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ তত্ত্বও জড়িত রয়েছে; যা একজন মানুষের অতীত সকল কার্য্যের ফল হিসেবে সৃষ্ট সম্ভাব্য শক্তি বিশেষ। ইহা হলো, আমাদের প্রত্যেকের ভাল-মন্দ কার্যের উপর ভিত্তি করে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ বা উপেক্ষানুভূতি সমূহ। ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, যদি একটি কুশল বা ভালো কর্ম বার বার সম্পাদন করা হয়, তাহলে সেই কুশল

কাজের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং এই সম্ভাব্য শক্তি ভবিষ্যতে অবিরাম কুশল কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। কর্ম সম্পাদনের সুত্র মতে তিন প্রকারে কর্ম সম্পাদন করা হয়; এগুলো হলো, কায়, মন, ও বাক্যের মাধ্যমে।

মহাযান (বড় গাড়ী বা যান)

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে, প্রধানত দু'ধারার শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, এদের একটি হলো, থেরবাদ এবং অন্যটি হলো মহাযান। থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল শ্রীলংকা, বার্মা, থ্যাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশে। অন্যদিকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তিব্বত, চীন, কুরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশে। মহাযান এই পদের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যুর এই সংসারে সকলেই দুঃখে জর্জরিত। এই দুঃখ হতে মুক্তি লাভে সকলকে শ্রেনী বৈষম্য ভুলে গিয়ে বুদ্ধজ্ঞান অর্জনের জন্য দিক নির্দেশনা দান করা।

নির্বাণ (সম্পূর্ণ স্থির এবং জাগ্রত অনাসক্ত অবস্থা)

আক্ষরিকভাবে, ইহার অর্থ হলো 'নিভিয়ে দেয়া, বের করে দেয়া বা উপশম লাভ করা'। ইহা চিত্তের এমন এক অবস্থা যেখানে সম্যক প্রজ্ঞা সাধনার ভিত্তিতে মানুষের সকল প্রকার আসক্তি এবং প্রচন্ড আবেগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। যাঁরা মনের এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তাঁদেরকে বুদ্ধ বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ ৩৫ বৎসর বয়সে এই অবস্থানে উপনীত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অতএব, বর্তমানে ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি পরিনির্বাপিত হওয়ার পরেই এই স্থির অবস্থানে পৌঁছেছেন, কারণ মানব দেহ যে পর্যন্ত এ ধরাধামে অবস্থান করে, সে পর্যন্ত মানবীয় সকল অবস্থা এই দেহকে ভিত্তি করে বিদ্যমান থাকে।

পালি (ভাষা)

এই ভাষা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে। খুবই প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। ইহা এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা, যা সংস্কৃত ভাষার আঞ্চলিক রূপ বিশেষ; পালি এবং সংস্কৃত ভাষার মধ্যে

তেমন বড় ধরনের পার্থক্য নেই। যেমন-পালি ভাষায় ধম্ম, সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম; পালি ভাষায় নিব্বাণ, সাংস্কৃত ভাষায় নির্বাণ ইত্যাদি। (সাংস্কৃতে বিস্তারিত দেখুন)

পারমিতা (এক তীর হতে অন্য তীরে অতিক্রমের বাহন)

"অন্য তীরে অতিক্রম করা মানে" বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন নিয়মানুবর্তীতা অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধ ভূমিতে উপনীত হওয়া। সাধারণত নিম্নোক্ত ৬টি কার্যকর নিয়মানুবর্তীতার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যেগুলোর দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর এই বিশ্ব অতিক্রম করে জ্ঞানের জগতে উপনীত হতে পারে। এগুলো হলো- দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা। জাপানের সংস্কৃতিতে পালিত বসন্ত ও শরতে Higan সপ্তাহ এই ধারণা হতে অনুসৃত হয়েছে।

প্রজ্ঞা (আধ্যাত্মিক জ্ঞান)

ইহা ছয় পারমিতার একটা। মনের ক্রিয়া যা মানুষকে ভুল-ভ্রান্তি হতে এবং সত্য ও মিথ্যাকে বুঝতে পারে মতো উপলব্ধি জাগ্রত করতে সাহায্য করে। যিনি এই প্রজ্ঞা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁকে বুদ্ধ বলা হয়। সুতরাং ইহা সর্বোত্তম পরিমার্জিত এবং আলোকিত জ্ঞান, যা অন্য সাধারণ মানবীয় জ্ঞান থেকে আলাদা।

সংঘ (বৌদ্ধ ভ্রাতৃ সংঘ)

ইহা ভিক্ষু সংঘ, ভিক্ষুণী সংঘ, উপাসক সংঘ, এবং উপাসিকা সংঘ নিয়ে গঠিত। প্রাচীন কালে ইহা গৃহত্যাগী পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের পরবর্তী সময়ে, পুরুষ বা মহিলা শ্রেণী বিন্যাস ব্যতিরেকে, যাঁরা বোধিসত্ত্ব জীবনের লক্ষ্যে জীবন ধারণ করেন, তাঁদের সকলকেই একসাথে ভ্রাতৃ সংঘের সদস্যভুক্ত করা হয়। এই সংঘ বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্নের মধ্যে একটি রত্ন।

সাংস্কৃত (ভাষা)

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ট সাহিত্যিক ভাষা; যা ইন্দো-ইউরোপিয়ান পরিবারের ভাষার একটি। ইহা বৈদিক ও শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃত এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের

গ্রন্হগুলো এই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল, যা বৌদ্ধ হাইব্রিড সাংস্কৃত (Buddhist Hybrid Sanskrit) বলে বলা হয়।

সংসার (পুনরায় দেহধারণ)

অবিরাম, অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে এই মায়াময় ৬টি রাজ্যে আমরা পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর যাঁতাকলে ঘুরপাক খাচ্ছি ; এই ৬টি রাজ্য হলো- নিরয়, পিত্তিবিসয়, তিরচ্ছানযোনি, অসূর, মানব ও স্বর্গ। বুদ্ধত্ব লাভ করা পর্যন্ত, কেহই সংসারের এই ভব চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবে না। যাঁরা এ ভব চক্র থেকে মুক্ত তাঁদেরকে বুদ্ধ বলা হয়।

শূন্যতা (বস্তুর বিদ্যমানতাহীন)

এই ধারণা হলো, জগতের সকল কিছুতে বিদ্যমানতা বলতে কিছু নেই। আবার স্হায়ীত্ব বলতেও কিছুই নেই। যা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়। যেহেতু সকল কিছুই কার্য-কারণ-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে, সেহেতু সেখানে কোন কিছুর স্হায়ীত্বের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু, কারো উচিৎ নয় যে, কোন বস্তুর বিদ্যমানতার ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখা, আবার এও ঠিক নয় যে একে ত্যাগ করা। সকল প্রাণী বা অ-প্রাণীর মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং, কোন একটি ধারণা, বা ভাবতত্ত্বকে একমাত্র সত্য হিসেবে আঁকড়ে ধরাটা বোকামিতা মাত্র। ইহাই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রজ্ঞা সূত্রের মৌলিক অন্তঃপ্রবাহ স্বরূপ।

সূত্র (ধর্ম গ্রন্হ)

বুদ্ধের শিক্ষা সম্বলিত স্মারক স্বরূপ। এই পদটির আদি অর্থ হলো "সুতা", যার দ্বারা বিশাল ধর্ম শিক্ষাকে বা বিজ্ঞানকে সংক্ষিপ্তাকারে বন্ধন করা হয়েছে। ইহা হলো পবিত্র ত্রিপিটকের অংশ।

থেরবাদ (অগ্রজদের শিক্ষা)

দক্ষিণাঞ্চলীয় বৌদ্ধ ধর্ম সাধারণত এই নামে পরিচিত। "থের" অর্থ হলো

অগ্রজ। তাই এই ধারার বৌদ্ধ ধর্মকে থেরবাদ বলা হয়। যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে সংরক্ষণশীল মহৎ ভিক্ষুদেরকে সমর্থন করেন, যাঁরা খুবই কঠোরভাবে বিনয়কে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, তাঁদেরকে থেরবাদী বলা হয়। তাঁরা প্রগতিশীল ও অন্য শ্রেণীর ভিক্ষুদের মতামতকে গ্রহণ করেননি, (বিশ্বাস করা হয় যে তাঁরা পরবর্তীতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বা উত্তরাঞ্চলীয় বৌদ্ধ ধর্মের ধারা প্রচার করেছিলেন)। এই ধরনের বিপরীত ধারার বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম দিক থেকেই শুরু হয়েছিল; বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের কয়েক শতাব্দী পর। তখন মহাদেব নামক এক প্রগতিশীল ভিক্ষু, দৃঢ়তারসাথে পাঁচ প্রকার শীলের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুক্তির পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই প্রচারণা থেরবাদ ও মহাসাংঘিকা হিসেবে বিভক্ত করে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত হয়।

ত্রিপিটক (তিনটি পাত্র বা আঁধার)

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের তিনটি শাখা, যার অর্থ হলো ধর্ম। এগুলো হলো-সূত্রাবলী, যে গুলোতে বুদ্ধের শিক্ষা বিদ্যমান, বিনয়-যেখানে নিয়মানুবর্তীতা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে এবং অভিধর্ম-যেখানে বিভিন্ন অর্থকথার মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে চীন ও জাপানের মহান ভিক্ষু সংঘরা বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ঐগুলো ও ধর্মশাস্ত্রে যোগ করা হয়েছিল। (ধর্মে দেখুন)

অঙ্গুত্তর নিকায়

ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁর জন্ম জগতের সকল প্রাণীকে সেবা করার জন্যে, সকল প্রাণীর সুখের জন্য; যিনি এই স্বর্গ-মর্ত্যের সকলকে তাঁর করুণার জলে সিক্ত করেন, সকলকে উপকার করেন, মঙ্গলের জন্যে এবং সুখের জন্য কাজ করেন। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এ পৃথিবীতে স্পষ্টভাবে কোন কিছু প্রকাশ করে এমন ব্যক্তির দর্শন লাভ করা খুবই কঠিন। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান লাভ করা কষ্টকর। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সবাই দুঃখ প্রকাশ করে। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এ পৃথিবীতে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন যিনি অতুলনীয়। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি স্পষ্টভাবে কোন কিছু প্রকাশ করা মানে গভীর অর্থপূর্ণ চোখ, গভীর জ্ঞানলোক, এবং গভীর ঔজ্জ্বল্যতাকে বুঝায়। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায় ১-১৩)

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হা এবং বুদ্ধের শিক্ষা গ্রন্হের বিতরণ প্রসঙ্গ

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হার কথা বলতে গেলে বিনয়ী ব্যবসায়ী Mr. Yehan Numata'র কথা এসে যায়, যিনি Mitutoyo প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও।

তিনি ১৯৩৪ সালে খুবই মূল্যবান পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যবসার সফলতা নির্ভর করে স্বর্গ, মর্ত্য ও মানুষের মাঝে একটি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে যা ছিল তাঁর আসল প্রত্যয় এবং মানবীয় মনের পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব শুধুমাত্র প্রজ্ঞা, করুণা ও সাহসিকতার ন্যায় বিচক্ষণতার সু-সমন্বয়ের দ্বারা। তিনি সবকিছুই এই প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাপক যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধনে এবং মানবীয় মনের উন্নতি সাধনে সক্রিয় ছিলেন।

তাঁর বিশ্বাস হলো এই যে, একমাত্র মানবীয় মনের পরিপূর্ণতা সাধনের মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি অর্জন সম্ভব, আর এই কারণেই বুদ্ধের শিক্ষা এই পৃথিবীতে বিদ্যমান। অতএব, তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্হাপনার সাথে সাথে, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বৌদ্ধ সংগীত, বুদ্ধের ছবি ও শিক্ষার প্রচার এবং আধুনিকীকরণের জন্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালান।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, তিনি ব্যক্তিগত অর্থায়নে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার কল্পে একই প্রতিষ্ঠানভুক্ত একটি স্হায়ী তহবিল গঠন করেন, এবং একই সময়ে, বিশ্ব শান্তি অর্জনে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও। অতপর, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হা একটি সাধারণ সংগঠন হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে।

কিভাবে বুদ্ধের শিক্ষা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং কিভাবে বুদ্ধের মহা প্রজ্ঞা ও করুণার আলো প্রত্যেক মানুষকে উপকৃত এবং আনন্দিত করেছিল ? এই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হার কাজ ছিল উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে উপায় অনুসন্ধান

করা, যা প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছাকে বজায় রেখেছে।

সংক্ষিপ্তভাবে, বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রচারের জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার উদ্যোগকে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উক্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

"বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি আমাদের এদেশের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিফলনের ফসল স্বরূপ। তেমন কিছু এখনও খুব কমই লিখিত হয়েছে, যাকে আমরা জাপানীদের ধারণা মতে অনুবাদিত বুদ্ধের শিক্ষা নামক বই বলতে পারি। প্রকৃত অর্থে, এর পরিবর্তে আমরা সর্বদা খুব গর্বের সাথে আমাদের বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে থাকি।

যারা এই বইটি পড়বে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এই বইটি একটি আধ্যাত্মিক খাদ্য হিসেবে পরিবেশিত হবে। ইহা যে কোন কেহ তার পড়ার টেবিলে বা সাথে করে বহন উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে এবং যখন এর সংস্পর্শে আসবে তখন এটা তাকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত করবে।

যদিও বইটাকে আমরা যেভাবে চেয়েছি সে ভাবে এখনও পর্যন্ত পূর্ণতা দান করতে পারিনি, অনেক লোকের শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে, সহজভাবে পড়ার জন্যে এবং বৌদ্ধ ধর্মের নির্ভরযোগ্য সূচনা ও একই সময়ে, দৈনন্দিন জীবনে একটি ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা মূলক গ্রন্হ হিসেবে সত্যের প্রতি প্রেরণা যোগানোর জন্যে, বুদ্ধের শিক্ষা নামক বর্তমান সংস্করণ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হার অভিপ্রায়, একদিন দেখা যাবে যে, অনেক পরিবারে এই বইটি আছে, অনেক বন্ধু অনুসারীরা এই বইটি পড়তে উৎসাহিত হবে এবং পরিশেষে মহান তথাগতের শিক্ষার আলোকে স্নাত হবে।

পাঠকের মন্তব্যকে সবসময় স্বাগত জানানো হবে। যে কোন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হায় লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

ভারত-বাংলার বৌদ্ধ সমাজের থেরবাদী পিটক এবং মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' গ্রন্থের আলোকে বুদ্ধের জীবন নিয়ে ধারণা ও বিশ্বাসের উপর প্রায় ২০০ বছরের এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কতৃপক্ষ 'বুক্কিয় দেনদো ক্যোকাই' মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশ অধ্যুষিত আধুনিক জাপানী বৌদ্ধ সমাজ মানসের উপযোগী করে বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন বর্তমান গ্রন্থের রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে। ডক্টর ভদন্ত জ্ঞান রত্ন থেরো মহোদয় বাংলা ভাষায় সেই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন বুদ্ধ জীবন নিয়ে বির্তক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নহে, বুদ্ধের শিক্ষার মৌলিক বিষয় গুলোর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের পরিচয় করে দেয়ার লক্ষ্যে। তাই এ অনুবাদ গ্রন্থে 'বুদ্ধের জীবন কথা' পরিচ্ছেদ সহ অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য পরিদৃষ্ট হবে, তাতে অনুবাদকের কোন হাত নেই; তা মূল রচয়িতার বিষয় বলে ধরে নিতে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে।

ভাষান্তর

ড. জ্ঞান রত্ন থেরো

অনুবাদকের পরিচিতি

ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন থেরো ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় গোবিন্দ-গুণালংকারের স্মৃতি বিজড়িত এবং বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে মুখরিত জোরবা বৌদ্ধ পল্লীতে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া এবং মাতার নাম স্বর্গীয়া শ্রীমতি মীরা রানী বড়ুয়া। তিনি সফলতার সাথে ১৯৮৪ সালে এস, এস, সি, এবং ১৯৮৬ সালে এইচ, এস, সি পাশ করার দরুন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে শিক্ষা বৃত্তি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তখন তিনি রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা শান্তিময় বিহারে অবস্থান করেছিলেন।

তিনি ১৯৮৬-৮৭শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হয়ে শিক্ষারত অবস্থায় ১৯৮৮ সালে Migration Certificate নিয়ে থ্যাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন মহাচুলালংকন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৯৩ সালে কৃতিত্বের সাথে বি, এ, (ইংরেজী) ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৯৪ সালে তিনি জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্যে Trident College of Language এ ভর্তি হন। ১৯৯৫ সালে উক্ত কোর্স শেষ করে তিনি আইচি গাক্কুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষাতত্ত্ব-বিদ ও জাতীয় অধ্যাপক Prof. Mayeda Egaku'র তত্ত্বাবধানে এম, এ, ডিগ্রীতে ভর্তি হয়ে, "The Origin of Abhidhamma and its Development" বিষয়ের উপর গবেষণা করে, ১৯৯৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তখন কৃতী ছাত্র হিসেবে জাপান সরকারের শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রনালয় হতে মনবুশো (Monbusho) বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৯৭ সালে পুনরায় ভদন্ত জ্ঞান রত্ন থেরো জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি নিয়ে একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং একই অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে এম, এ, ডি, লিট্ ডিগ্রীতে ভর্তি হন। ২০০০ সালে তিনি "The Way of Practicing Meditation in Theravada Buddhism" এর উপর গবেষণা করে কৃতিত্বের সাথে এম, এ, ডি, লিট্ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ২০০১ সালে তাঁর গবেষণা লব্ধ পুস্তকটি জাপানে প্রকাশিত হয়। তিনি থেরবাদ ও জেন ভাবনার উপর গবেষণার জন্যে Bukkyo Dendo Kyokai হতেও বৃত্তি লাভ করেন। ড. জ্ঞান রত্ন উচ্চতর গবেষণার জন্যে ২০০১ সালে জাপান সরকারের শিক্ষা, আর্ট, বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অন্তর্গত "Japan Society for the Promotion of Science" (JSPS) থেকে "Postdoctoral Fellow" হিসেবে বৃত্তি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে "জাপানীজ কালচারাল স্টাডিজ" বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

এছাড়াও ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন থেরো জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে কাজ করে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন থেরো'র শিক্ষা জীবনের সকল সাফল্যের পিছনে যিনি বিনিদ্রিত সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, তিনি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধুতাংগসাধক পরম পুজ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়। যিনি এই অনুবাদ গ্রন্থটির সংশোধনী কাজেও সহযোগিতা করেছেন।